আধুনিক রবিনহুড

হেমেন্দ্রকুমার রায়

আধুনিক রবিনহুড

এক

সিনেমায় গিয়ে কিংবা বই পড়ে বিলাতের উদার ডাকাত রবিনহুডের সঙ্গে তোমাদের নিশ্চয় চেনাশুনা হয়েছে। রবিনহুড ইংল্যান্ডের সেরউড অরণ্যে বাস করত এবং ধনীদের টাকা লুটে গরিবদের বিলিয়ে দিত।

কিন্তু একালের আর-একজন রবিনহুডের নাম এখনও পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। সেকালে সত্যই রবিনহুড বলে কেউ ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু একালের এই রবিনহুডের সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ নেই। সে সত্যিকার মানুষ।

তার আসল নাম হুগো ব্রিটউইজার। সে অস্ট্রিয়ার লোক এবং তার কার্যক্ষেত্র-ভিয়েনা শহরে।

হুগো রীতিমতো ভদ্র পরিবারের ছেলে। সে শিক্ষিত ও ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু তার মাথা এত সাফ যে, নিজের যত্নে ও অধ্যবসায়ে সে আরও নানান বিদ্যায় পাকা হয়ে উঠেছিল।

তালা-চাবি, সিন্দুক, বাক্স ও গরাদ প্রভৃতি তৈরি করবার জন্যে যে-সব লোহা ও অন্যান্য ধাতু ব্যবহৃত হত, তাদের শক্তির খুঁটিনাটি সমস্তই সে জানত। লোহা ও ইস্পাতের উপরে কোন অ্যাসিডের কতটা প্রভাব, রসায়ন-বিদ্যা শিখে তাও সে জেনে নিয়েছিল। অক্সি-অ্যাসিটিলিন টর্চ দিয়ে কেমন করে ইস্পাতের দরজায় ছাদা করতে হয়, তাও তার অজানা ছিল না।

সে নিজের হাতে নানারকম অদ্ভুত যন্ত্র তৈরি করতে পারত। চোর-ডাকাত ধরবার জন্যে একালের পুলিশ যেসব বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে, সে-সমস্তই ছিল তার নখদর্পণে।

বিখ্যাত ডিটেকটিভদের সমস্ত চাতুরির কাহিনিই সে পড়ে ফেলেছিল। সে রীতিমতো ব্যায়াম করত। জুজুৎসু, কুস্তি ও বক্সিংয়ের সব পাঁচই খুব ভালো করে শিখেছিল।

যখন তার সমস্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ হল, তখন হঠাৎ একদিন সে বাড়ি থেকে একেবারে গা ঢাকা দিলে। বাড়ির লোকে জানলে, হুগো দেশ ছেড়ে আমেরিকায় গিয়েছে।

সে কিন্তু ভিয়েনা শহরেই লুকিয়ে রইল। ছোটলোকদের বস্তির ভিতরে একখানা ঘর ভাড়া নিলে। দিন-রাত সেই ঘরে একলা বসে লেখাপড়া করতে লাগল এবং দাড়ি-গোঁফ কামানো ছেড়ে দিলে। কিছুদিন পরে দাড়ি-গোঁফে তার মুখ এমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল, কোনও চেনা লোকের পক্ষেও তাকে চেনা আর সহজ রইল না।

.

দুই

সেবার বড়দিনের মুখে অস্ট্রিয়ায় এমন হাড়ভাঙা শীত পড়ল যে, তেমন শীত আর কেউ কখনও দেখেনি।

অস্ট্রিয়া হচ্ছে শীতপ্রধান দেশ। সেখানে ঘরের ভিতরে কয়লার আগুন জ্বেলে না রাখলে ঠান্ডায় মারা পড়বার সম্ভাবনা হয়। তার উপরে আবার এই অতিরিক্ত শীত।

সুবিধা বুঝে দুষ্ট ব্যবসায়ীরা কয়লার দাম অসম্ভব বাড়িয়ে দিলে। ধনীদের কোনও বালাই নেই, বেশি ঠান্ডায় বেশি কয়লা কিনে পোড়াবার শক্তি তাদের আছে। কিন্তু যত অসুবিধা হল, গরিব বেচারিদের! চড়া দামে কয়লা কেনবার সঙ্গতি নেই,অথচ চারিদিকে বরফ পড়ছে, দেহের রক্ত জমাট হয়ে যাচ্ছে। আগুন পোয়াতে না পেরে অনেকে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘুমিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু সে ঘুম আর এ-জীবনে ভাঙল না!

বড়দিন আসতে মাত্র দুদিন দেরি। শীতার্ত এক সন্ধ্যায় ভিয়েনার এক বড় ব্যবসায়ী তার দোকানঘর বন্ধ করবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় ফিটফাট পোশাক পরা এক যুবক। তার দোকানে এসে ঢুকল।

যুবক বললে, আমি হচ্ছি কোনও দয়ালু মস্ত ধনীর সেক্রেটারি। আমার মনিব তার নাম প্রকাশ করতে রাজি নন। তিনি এক হাজার গরিব পরিবারকে কয়লা দান করতে চান। কিন্তু আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত কয়লা পাঠাতে হবে। যাদের কাছে পাঠাতে হবে, আমি এখনি তাদের ঠিকানা দিচ্ছি। কিন্তু আজকের এত কয়লা পাঠাতে পারবে কি?

ব্যবসায়ী বললে, কেন পারব না? কিন্তু এত কয়লার দাম যে, অনেক হাজার টাকা।

যুবক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নোটের তাড়া বের করে বললে, দাম নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

ব্যবসায়ী কয়লা পাঠাবার ব্যবস্থা করলে। যুবক সমস্ত দাম চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল!

রাত হয়েছে বলে ব্যবসায়ী নোটের তাড়া ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারলে না। লোহার সিন্দুকে নোটগুলো পুরে দোকান বন্ধ করলে। একদিনেই এই আশাতীত লাভে তার মুখে হাসি আর ধরে না।

সে-রাত্রে ভিয়েনার এক হাজার দরিদ্র পরিবারের মধ্যেও হাসিখুশির ধুম পড়ে গেল। দাতার দানে ঘরে ঘরে কয়লা পুড়ছে, শীতের চোটে প্রাণের ভয় আর নাই।

.

তিন

পরদিন প্রভাতে ব্যবসায়ীর মুখের হাসি শুকিয়ে গেল।

স্তম্ভিত চক্ষে সে দেখলে, তার লোহার সিন্দুক খোলা, কাল রাতে পাওয়া সেই নোটের তাড়া তো নেই-ই, সঙ্গে-সঙ্গে আরও অনেক টাকা অদৃশ্য হয়েছে! সে তখনি পুলিশে খবর দিতে ছুটল।

গোটা শহরে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কাগজে কাগজে অজানা দাতার এই অদ্ভুত দান ও অজানা চোরের এই অদ্ভুত চুরির কাহিনি এবং লোকের মুখে মুখে কেবল তারই আলোচনা!

কে এই দাতা? কে এই চোর?

ইউরোপে ভিয়েনার পুলিশের ভারি সুনাম! কিন্তু সে সুনামে আজ কোনও ফল হল না। এই বিস্ময়কর চোর এমন সুচতুর ও সাবধানী যে, ধরা পড়বার কোনও সূত্রই পিছনে রেখে যায়নি!

দু-চারদিন যেতে না-যেতেই উত্তেজনার উপরে আবার নতুন উত্তেজনা। ভিয়েনার শত শত খবরের কাগজে এই পত্রখানি বেরুল :

ব্যবসায়ীর লোহার সিন্দুক থেকে আমি যা নিয়েছি, তা হচ্ছে আমার নিজের টাকা। ওই নীচ ব্যবসায়ী এই শীতে অকারণে কয়লার দাম বাড়িয়ে গরিবদের অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাই তার এই শাস্তি।
ব্যবসায়ীর বাকি যে টাকাগুলো নিয়েছি, তা হচ্ছে আমার পারিশ্রমিক। ইতি–
রবিনহুড

বলা বাহুল্য, আসলে এই আধুনিক রবিনহুড আমাদের পূর্বপরিচিত হুগো ছাড়া আর কেউ নয়।

তারপরে প্রায়ই ভিয়েনা শহরে বড়-বড় চুরির মহা ধূম পড়ে গেল! ধনীদের সুরক্ষিত অট্টালিকা, কৃপণের লোহার দরজা, দুর্ভেদ্য ইস্পাতের সিন্দুক, চোরের কাছে সমস্তই যেন নগণ্য হয়ে উঠল!

দেশব্যাপী অভিযোগে ও ক্রমাগত ছুটাছুটি করে ভিয়েনায় বিখ্যাত পুলিশ বাহিনীও দস্তুরমতো কাহিল হয়ে পড়ল। কোনও চুরিতেই চোর সামান্য সূত্রও রেখে যায়নি। চোরেরা হঠাৎ এমন অসম্ভব চালাক হয়ে উঠল কেমন করে?

কিছুকাল পরে পুলিশ অনেক সন্ধান দিয়ে আবিষ্কার করলে যে, এক-একটা বড় চুরি হওয়ার পরেই শহরের গরিব লোকরা অজানা দাতার কাছ থেকে বহু টাকা পুরস্কার পায়।

পুলিশ মাথা ঘামিয়ে বুঝতে পারলে যে, এসব চুরি বহু চোরের কীর্তি নয়, সব চুরির মূলেই আছে নিশ্চয়ই সেই অদ্ভুত রবিনহুড!

কিন্তু এই আবিষ্কারেও কোনও লাভ হল না। কে এই রবিনহুড? কোথায় সে থাকে?

.

চার

কিছুতেই যখন রবিনহুডের ঠিকানা পাওয়া গেল না, তখন তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে পুলিশ এক নতুন উপায় অবলম্বন করলে।

নানান খবরের কাগজে এক হঠাৎ ধনী মাংস-ব্যবসায়ীর কথা প্রকাশিত হল। তার টাকাকড়ি, হিরা-জহরতের নাকি অন্ত নেই! সে নাকি এখন মাংস ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে শৌখিন ধনীর মতো শহরের নবাবি করতে এসেছে।

নানা থিয়েটারে ও উৎসবের আসরে তাকে সপরিবারে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল। তার বউ ও মেয়েদের গায়ে এত জড়োয়ার গয়না যে, চোখ যেন ঝলসে যায়!

কিন্তু বাড়িতে ফিরে তারা নাকি খুব সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। রাতদুপুরের আগেই তাদের বাড়ির সব আলো নিবে যায়!

একরাত্রে বাড়ির সব আলো নিবে গেছে এবং সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

যে-ঘরে তাদের গয়নার সিন্দুক থাকে সেই ঘরে কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। যেন ইঁদুরেরা কুট কুট করে কি কাটছে!

অন্ধকারে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল এবং চারজন ডিটেকটিভ দৌড়ে গিয়ে দেখলে যে লোহার সিন্দুকের সামনে একটি যুবক বসে আছে। রবিনহুড পা দিয়েছে পুলিশের ফাঁদে!

হুগো কিন্তু পুলিশের চেয়ে ঢের বেশি চটপটে!

এক মুহূর্তে তার হাতের রিভলভার ঘন-ঘন গর্জন করে উঠল এবং আলোগুলো গুলির চোটে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল!

আবার আলো জ্বেলে দেখা গেল, ঘরের মেঝের উপরে এক ডিটেকটিভ আহত ও আর-একজন নিহত হয়ে রয়েছে এবং রবিনহুড হয়েছে অদৃশ্য!

কিন্তু এত করেও হুগো পালাতে পারলে না।

অন্ধকার জানলা দিয়ে বেরিয়ে, দড়ি বেয়ে সে পথে গিয়ে নামতে না-নামতেই একদল পুলিশের লোক এসে তাকে চারিদিক থেকে জড়িয়ে ধরলে!

মহাবলবান হুগো দানবের মতো যুদ্ধ করতে লাগল, শত্রুর পর শত্রুকে বার-বার কাবু করে ফেললে, কিন্তু তবু রক্ষা পেলে না! পুলিশের দল বড়ই ভারি, হাতে হাতকড়া পরে এতদিন পরে তাকে কারাগারেই যেতে হল!

.

পাঁচ

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় বন্দি হুগো কারাকক্ষের রক্ষীকে ডেকে বললে, ওহে, আজ বোধহয় সমস্ত খবরের কাগজেই আমার কীর্তির কথা বেরিয়েছে?

তা বেরিয়েছে বইকী!

সেগুলো আমাকে পড়াতে পারো? আমি দামও দেব, তোমাকে বখশিশও দেব।

রক্ষী এতে কোনও দোষ দেখলে না। খানিক পরেই সে বস্তা-বস্তা কাগজ কিনে এনে দিলে। ভিয়েনা শহর তো কলকাতার মতো নয়, সেখানে লোক থাকে উনিশ লাখের কাছাকাছি, আর তাদের প্রায় সকলেরই রোজ খবরের কাগজ পড়া অভ্যাস। কাজেই ভিয়েনায় প্রত্যহ খবরের কাগজ বেরোয় শত-শত। এইসমস্ত কাগজের স্তূপ এত উঁচু হল যে, হুগোর মূর্তি তার মধ্যে প্রায় ঢাকা পড়ে গেল।

কয়েদখানার ঘরের বাইরে সমগ্র সশস্ত্র রক্ষী পায়চারি করছে এবং মিনিট-পনেরো অন্তর জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে হুগোকে দেখে যাচ্ছে। প্রতিবারেই দেখে, সে যেন গর্বে স্ফীত হয়ে একমনে খবরের কাগজে নিজের কীর্তিকাহিনি পাঠ করছে!

হুগো কিন্তু কাগজ পড়ছিল না। যেই রক্ষী চলে যায়, অমনি সে দাঁড়িয়ে ওঠে এবং অন্যদিকের একটা জানলার কাছে গিয়ে খুব ছোট্ট একখানা উকো বার করে গরাদের উপর ঘষতে থাকে। খুব পাতলা অথচ শক্ত ইস্পাতের পাতে এই উকো তার নিজের হাতে তৈরি। পুলিশ জামাকাপড় হাতড়ে তার সব জিনিস কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু এই উকো লুকানো ছিল তার জুতোর সোলের মধ্যে।

মাঝরাত্রে সে রক্ষীকে ডেকে বললে, ওহে ভাই, আমার চোখ একে খারাপ, তায় এই কামরার আলোর জোর নেই। খবরের কাগজের এখানটা বড় ছোট-ছোট হরফে ছাপা। জানলার কাছে এসে এ-জায়গায় তুমি আমাকে পড়ে শোনাবে?

রক্ষী রাজি হয়ে যেই গরাদের কাছে এল, হুগো অমনি নিজের উকো দিয়ে কাটা গরাদের লোহার আঘাতে তাকে একেবারে অজ্ঞান করে ফেলে। তারপর হাত বাড়িয়ে রক্ষীর পকেট থেকে দরজা খোলবার চাবি বার করে নিলে।

.

শেষ রাতে রক্ষী বদলাবার সময় এল। নতুন রক্ষী এসে পুরোনো রক্ষীকে দেখতে না পেয়ে উপরওয়ালাদের খবর দিলে।

কামরায়-কামরায় খোঁজাখুঁজির পর হুগোর ঘরে পুরোনো রক্ষীর মৃতদেহ পাওয়া গেল। কিন্তু হুগো কোথায়? তার কয়েদির পোশাক রয়েছে রক্ষীর দেহে, কিন্তু রক্ষীর পোশাক কোথায়?

ঘরের মেঝেতে অনেকগুলো খবরের কাগজ-পাকানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বন্দির বিছানার গদি টুকরো-টুকরো করে কাটা। এ-সবের অর্থ কি?

তারপর দেখা গেল, একটা জানলার একটা গরাদ নেই। এবং আর-একটা গরাদে থেকে পাকানো-খবরের কাগজের দড়ি ঝুলছে!

আশ্চর্য এই দড়ি! প্রথমে পাঁচ-ছয়খানা খবরের কাগজ নিয়ে একসঙ্গে পাকানো হয়েছে। তারপর পাছে পাক খুলে যায়, সেই ভয়ে গদির কাটা কাপড় জড়িয়ে তাকে শক্ত করা হয়েছে। তারপর একখানা পাকানো কাগজের সঙ্গে আর-একখানা কাগজ বেঁধে ফেলা হয়েছে। তারপর সেই দড়ি ধরে হুগো নীচে নেমে চম্পট দিয়েছে!

আজও সেই অদ্ভুত দড়ি ভিয়েনা পুলিশের যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

.

ছয়

সেই সময়েই অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সঙ্গে প্রায় সারা ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধল এবং সেই আধুনিক কুরুক্ষেত্রের পৃথিবীব্যাপী কোলাহলে হুগোর কথা চাপা পড়ে গেল।

চার বৎসর পরে যখন মৃত্যুস্রোত বন্ধ হল, অস্ট্রিয়ার আকার ও শক্তি তখন নগণ্য। এই জাতীয়-অধঃপতনের সময়ে হুগোর কথা নিয়ে পুলিশও মাথা ঘামাতে পারেনি।

যে মাংস-ব্যবসায়ীকে অবলম্বন করে পুলিশ হুগোকে ধরেছিল, সে এখন সত্যসত্যই অগাধ টাকার মালিক! বড়-বড় আমির-ওমরাহদের নিমন্ত্রণ করে প্রায়ই সে ভোজ দেয়!

একদিন এক বড় হোটেলে কাউন্ট রিচার্ড নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ হল এবং সেই আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হতে দেরি লাগল না।

কাউন্ট একদিন বললেন, বন্ধু, এ-রকম ছোট ছোট ভোজ দিয়ে কোনও লাভ নেই। এমন এক ভোজ আর বল-নাচ দাও, যা সারা রাত ধরে চলবে! দেশের সমস্ত ধনী মেয়ে পুরুষকে নিমন্ত্রণ করো। তাহলে তোমার খ্যাতির আর সীমা থাকবে না!

মাংস-বিক্রেতা ধনী হয়ে আজ সন্ত্রান্ত সমাজে নাম কিনতে চায়। সে তখনই রাজি হয়ে গেল এবং এই বিরাট আয়োজনের ভার দিলে, কাউন্ট রিচার্ডেরই হাতে।

ভোজের রাত্রে ভিয়েনার সমস্ত সম্ভ্রান্ত নর-নারী মাংস-বিক্রেতার বাড়িতে এসে হাজির। চারিদিকে মণিমুক্তায় বিদ্যুৎ জ্বলছে।

কাউন্ট তার বন্ধুকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, ওহে, এসব ব্যাপারে নাচের সময়ে প্রায়ই দামি গয়নাগাঁটি চুরি যায়। তোমার অতিথিদের বলো, বেশি দামি গয়নাগুলো আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে তোমার লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে দিতে। নাচ শেষ হলে আবার সেগুলো ফিরিয়ে দিও।

সেই কথামতোই কাজ হল!

শেষ রাতে বল-নাচ হয়ে গেলে পর, অতিথিরা গয়না ফেরত চাইলেন।

কিন্তু লোহার সিন্দুক খুলে দেখা গেল, প্রায় চার লক্ষ টাকার গহনার একখানাও নেই। কাউন্ট রিচার্ডেরও খোঁজ পাওয়া গেল না!

দেশময় হইচই! এমন চুরির কথা কেউ কখনও শোনেনি! সবাই অবাক! পুলিশও হতভম্ব!

কোনও-কোনও খবরের কাগজ তখন মনে করিয়ে দিলে যে, এই মাংস-ব্যবসায়ীর বাড়িতেই রবিনহুড ধরা পড়েছিল! আজ চার বছর পরে রবিনহুড প্রতিশোধ নিয়েছে।

কথাটা পুলিশের মনে লাগল। চারিদিকে দলে-দলে ডিটেকটিভ ছুটল, কিন্তু দীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে রবিনহুডের কোনও পাত্তাই পাওয়া গেল না।

.

সাত

দুই বৎসর পরে গুপ্তচরের মুখে খবর পাওয়া গেল, ভিয়েনা থেকে বিশ মাইল দূরে, ছোট্ট এক শহরে এক যুবক একাকী বাস করে। সে ধনী, কিন্তু কারুর সঙ্গে মেশে না। বাড়িতে বসে লেখাপড়া করে, ও মাঝে-মাঝে বাইসাইকেল চড়ে বেড়াতে যায়।

পুলিশ ভাবতে লাগল,কে সে? কেন সে একলা থাকে? কেমন করে তার সংসার চলে? একবার তো তাকে দেখা দরকার!

হুগোকে চেনে এমন লোকের সঙ্গে একদল সশস্ত্র পুলিশ পাঠানো হল।

দূর থেকে দেখা গেল, একজন লোক বাইসাইকেল চড়ে আসছে!

হ্যাঁ! ওই তো হুগো রবিনহুড!

পুলিশ বন্দুক তুললে, হুগোও রিভলভার বার করলে।

কিন্তু হুগো ধরা পড়ল না, পুলিশের গুলিতে মরণের মুখে আত্মসমর্পণ করলে!

.

বিচিত্র এই আধুনিক রবিনহুডের জীবন! হুগো ধনীর টাকা চুরি করে গরিবকে দান করত। কিন্তু অসৎ পথে গিয়ে সকাজ করার যে-কোনও মূল্যই নেই, হুগোর অকালমৃত্যু সেইটেই প্রমাণিত করছে!

হুগোর যে বুদ্ধি, যে প্রতিভা ও যে সাহস ছিল, ভালো পথে থাকলে নিশ্চয়ই সে আজ দেশবিদেশে প্রাতঃস্মরণীয় অমর ব্যক্তি হতে পারত।

ভালো কাজ যদি করতে চাও, ভালো পথে থাকতে হবে।